ANTARVIDYA
https://debracollege.ac.in/antarvidya/index.aspx

Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15812707 VOL-1, ISSUE-1, June:2025 Page 33-44

রাজা রামমোহন রায়: যুগান্তকারী রাজনৈতিক চিন্তা

ড. মিঠুন ব্যানার্জ্জী, সহকারী অধ্যাপক, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়।

Submitted on: 24.04.2024
Accepted on: 20.03.2025

সংক্ষিপ্তসার - নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব রাজা রামমোহন রায় শুধু একটি যুগের প্রতিনিধি ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতির জটিল পরিবর্তনের এক অগ্রদূত। বাংলার নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে তাঁর অবদান যেমন অনস্বীকার্য, তেমনই ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসেও তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড শুধু সমাজকে নতুন দৃষ্টিকোণ দিয়েছিল তা-ই নয়, বরং ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ভাবনার ভিতও রচনা করেছিল। রাজনীতির ছাত্রছাত্রীদের কাছে রাজা রামমোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গি আজও এক প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয় বিষয় হিসেবে গণ্য হয়।এই প্রবন্ধে মূলত বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কীভাবে রাজা রামমোহন রায় ধর্মসংস্কারের মাধ্যমে সমাজে এক ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই প্রক্রিয়ায় সমকালীন উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তন, সতীদাহ প্রথা রদে আন্দোলন, নারী শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ এবং যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে তিনি সমাজ সংস্কারের যে রূপরেখা নির্মাণ করেছিলেন, তা এক আধুনিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রচিন্তার পরোক্ষ ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। প্রবন্ধটিতে তাঁর ধর্মচিন্তা, ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ, নৈতিকতা ও মানবতার উপর তাঁর নির্ভরতা, জনমতের প্রতি আস্থা এবং লোকশিক্ষা বিষয়ক মতামতকে কেন্দ্র করে রাজা রামমোহনের রাষ্ট্রভাবনার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষত, তাঁর যুক্তিবাদী মনোভাব ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শে যে প্রভাব ফেলেছিল, তা এখানে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।এছাড়াও, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনধারার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক মতামতের মধ্যে থাকা সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধিতাগুলিকেও চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন, একদিকে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিনির্ভর সমাজের কথা বললেও, অন্যদিকে তাঁর ব্যক্তিজীবনে কখনও কখনও ঐতিহ্য ও সংস্কারের সঙ্গে আপোষের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই দ্বৈততা কখনও কখনও তাঁর চিন্তার বাস্তব প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এই সমস্ত দিককে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই প্রবন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের রাষ্ট্রচিন্তা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি সমন্বিত রূপ তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

সূচক শব্দ- নবচেতনার উন্মেষ, ভারতীয় জীবনদর্শন, আধ্যাত্মিক ধারা, একেশ্বরবাদ, মূল্যবোধ, লোকশিক্ষা, গণবীক্ষা, শ্রেণিবৈষম্য, স্ববিরোধিতা।

Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15812707

রাজা রামমোহন রায়কে ভারতীয় ইতিহাস, বিশেষ করে বাংলার আধুনিক ইতিহাসে যুগান্তকারী পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করা হয়। ঊনবিংশ শতকের বাংলা সমাজে যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল, তা সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে গভীর পরিবর্তন এনেছিল। এই নবজাগরণ ছিল এক নবচিন্তার প্রবাহ, যা সমাজে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটায়। এই নবচেতনার আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন একাধিক মনীষী ও চিন্তানায়ক।বাংলার নবজাগরণকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো চিন্তাবিদ ও মনীষীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে এই নবজাগরণের ইতিহাসে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন নিঃসন্দেহে অগ্রপথিক। তিনি ছিলেন নবচেতনার সেই প্রথম পুরুষ, যিনি যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও সমাজ সংস্কারের আলোকে বাংলার সমাজকে নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন। তাঁর প্রজ্ঞা, বুদ্ধিবৃত্তিক মনোভঙ্গি এবং তৎকালীন সমাজবাস্তবতার গভীর উপলব্ধি তাঁকে নবজাগরণের পুরোভাগে নিয়ে আসে। রাজা রামমোহন রায় প্রগতিশীল ধর্মভাবনার প্রচারের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেন। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠা, নারী অধিকারের পক্ষে মতদান, ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অবস্থান তাঁর চিন্তার বাস্তব দৃষ্টান্ত। তবে, বাংলার এই নবজাগরণ কতটা গভীর প্রভাব ফেলেছিল সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার উপর? অর্থনৈতিক কাঠামোয় এর কী ধরনের প্রতিফলন ঘটেছিল? এবং এই নবজাগরণ কি আদৌ ইউরোপীয় পুনর্জাগরণের মতো কোনো ভিত্তিগত সমাজবদলের পথ প্রশস্ত করেছিল? এই সমস্ত প্রশ্নের নিরীক্ষার মাধ্যমেই রামমোহনের অবদানের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ধারণ করা সম্ভব। এছাড়াও, তাঁর ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে দেখা জরুরি যে, তাঁর জীবনযাপন কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল তাঁর প্রচারিত রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে। কারণ, সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত তাঁর যে দার্শনিক অবস্থান, তা বিশ্লেষণ করে দেখলেই বোঝা যাবে তাঁর চিন্তার গভীরতা, স্ববিরোধ এবং বাস্তব প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিত। এসবের আলোকে রামমোহন রায়ের নবজাগরণে অবদান কতটা মৌলিক ও দীর্ঘমেয়াদী ছিল, তা মূল্যায়ন করাও একান্ত প্রয়োজন।

নবজাগরণ ও ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে রামমোহনের রাষ্ট্রভাবনা: মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলাসহ সমগ্র উপমহাদেশের সামাজিক পরিসরে চরম অবনতি লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুসমাজ সেই সময়ে এক গভীর মনোবৈকল্যের শিকার হয়, কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের কোনও বাস্তব সম্ভাবনা ছিল না। সেইসঙ্গে অশিক্ষা, অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের আঁধারে সমাজ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। ধর্মীয় অনুশাসনের বদলে পুরোহিততন্ত্রের প্রভাব বাড়তে থাকায় আচার-অনুষ্ঠান ও লোকবিশ্বাস সমাজজীবনে অযাচিত প্রাধান্য লাভ করে। এই রকম এক অবক্ষয়গ্রস্ত সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ইউরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও বৌদ্ধিক জাগরণ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি উপলব্ধি করেন, ব্রিটিশ শাসিত ভারতে একটি নবীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটছে— যাদের যুক্তিবাদী মনোভাব, আত্মবিশ্বাস এবং কর্মশক্তির মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেই সংস্কারহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অনুন্নত সামাজিক পরিকাঠামোর ভিতরে তাদের সম্ভাবনার বিকাশ সম্ভব নয়। এই উপলব্ধিই রামমোহনকে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের পথে অগ্রসর করে। রাজা রামমোহনের পারিবারিক পটভূমিও তাঁর চিন্তাচেতনায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর পিতৃপরিবার ছিল বৈষ্ণব মতাদর্শে বিশ্বাসী, অপরদিকে মাতৃকূল অনুসরণ করত শাক্ত পরম্পরা। বেনারসে তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র পাঠ করেন, এবং পাটনায় তিনি ফারসি ও আরবি ভাষার মাধ্যমে ইসলামি ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। এই ইসলামি চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে তিনি হিন্দু ধর্মের অনেক আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে একটি যুক্তিনির্ভর সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। তবে তাঁর মধ্যে ধর্মতাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা ছিল

গভীর। তিনি হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্ম ছাড়াও খ্রিস্টধর্ম, তিব্বতের লামা বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি ধর্মীয় দর্শনকেও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। এই ধর্মতাত্ত্বিক তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি এক প্রকার একেশ্বরবাদী ধর্মের রূপরেখা নির্মাণে ব্রতী হন— যা যুক্তি ও নৈতিকতার ভিত্তিতে গঠিত এবং যে ধর্ম চিন্তা ও কর্মে উদীয়মান মধ্যশ্রেণির আত্মবিশ্বাসী অগ্রযাত্রাকে সহায়ক করতে পারে। এইভাবে, রাজা রামমোহন রায় এক বহুমাত্রিক ধর্মচিন্তার ভিত গড়ে তুলে, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে একটি আধুনিক ও বাস্তবসম্মত সামাজিক ভিত্তি নির্মাণের প্রয়াস নিয়েছিলেন।

রামমোহনের ধর্মভাবনা ও সমাজদর্শন: রাজা রামমোহন রায় মনে করতেন, ধর্ম এমন কিছু চিরন্তন, অপরিবর্তনশীল ও সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা সময় ও স্থানের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়। তবে একইসঙ্গে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে ধর্মের একটি প্রাত্যহিক, সমাজকেন্দ্রিক রূপও রয়েছে। মানুষের সামাজিক পরিচয় যেমন সময়ের সাথে রূপান্তরিত হয়, তেমনই ধর্মীয় আচরণ ও রীতিনীতিও সমাজের বিবর্তনশীল ধারার দ্বারা প্রভাবিত হয় ও পরিবর্তিত হয়। এই উপলব্ধি থেকেই রামমোহন কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ধর্মাচরণে সংস্কার আনতে আগ্রহী ছিলেন না, বরং ধর্মীয় সংস্কারকে সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এক কার্যকর প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছিলেন। পূর্ববর্তী সাধকরা যেখানে ধর্মকে নিছক আধ্যাত্মিক বা আত্মগত চর্চা হিসেবে দেখতেন, সেখানে রামমোহন ধর্ম সংস্কারের সামাজিক ও নীতিনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীকার অজিত কুমার চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে বলেন, "রামমোহনের পূর্বে আমাদের দেশে যেসব মনীষী ও সাধক ছিলেন, তাঁরা ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সমাজতত্ত্ব বা শাসনব্যবস্থা ও আইন প্রভৃতি কার্যকর জনজীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়ে এমন সুস্পষ্ট যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেননি... রামমোহন যেমন ধর্মের অনাবশ্যক আচারবিচার দূর করতে সচেষ্ট হন, তেমনই ধর্মকে সামাজিক ভিত্তির সঙ্গে সংযুক্ত করতেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন— এটি আধুনিক কালের এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি।" ধর্ম ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে রামমোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গি নিছক ধর্মতাত্ত্বিক উপলব্ধি ছিল না, বরং তা ছিল এক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, যুক্তিনির্ভর মনন। পাশ্চাত্য রেনেসাঁ এবং প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মসংস্কারের প্রভাব যেমন ইউরোপে ধর্ম ও সমাজকে যুগপৎ বদলাতে অনুপ্রাণিত করেছিল, তেমনি রামমোহনও বিশ্বাস করতেন যে ধর্মে সংস্কার ঘটলে তার প্রতিফলন সমাজজীবনের পরিবর্তনের মধ্যেও ঘটবে। এইভাবেই তিনি ধর্মকে একটি স্থবির অনুশাসন না ভেবে এক প্রগতিশীল ও সমাজগত রূপান্তরের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আলেকজান্ডার ডাফের জীবনীকার জর্জ স্মিথ বলেছিলেন যে 'Having read about the rise and progress of Christianity in apostolic times and its corruption in succeeding ages and then of Christian reformation which shook off these corruption and restored it to its primitive purity , I began to think that something similar might have taken place in India and similar result might follow here from a reformation of popular idolatry'।[২] তবে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে ধর্ম ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল একরৈখিক নয়, বরং তা ছিল দ্বিমাত্রিক ও পারস্পরিক নির্ভরশীল। ইউরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলন যেমন সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল, তেমনি সমসাময়িক কালে সমাজের ভেতরে ঘনিয়ে ওঠা আর্থসামাজিক পরিবর্তনের ঢেউ ধর্মীয় চিন্তাধারা, ধর্মাচরণ এবং ধর্মীয় সংগঠনের গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

রাজা রামমোহন রায় গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে ধর্মসংস্কার শুধু আধ্যাত্মিক জগতে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা একটি জাতির রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন,

Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15812707

প্রোটেস্টান্ট খ্রিষ্টধর্ম ইউরোপে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশে সহায়ক হয়েছিল এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও উদ্যোগী মানসিকতার জন্ম দিয়েছিল। সেই অনুরূপভাবে, হিন্দুধর্মের সংস্কারের মধ্য দিয়ে রামমোহন এমন এক বহুমুখী ধর্মচর্চার পক্ষে মত দেন যা অনুসারীদের মধ্যে রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার মতাদর্শ ও মানসিকতার জন্ম দিতে সক্ষম হয়। এই প্রেক্ষিতে রামমোহন রায় এক পত্রে উল্লেখ করেন, তিনি মনে করেন যে, যদিও হিন্দুরা ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়, তথাপি হিন্দুধর্মের কাঠামো ও রীতিনীতিগুলি কোনও সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক সচেতনতাকে মাথায় রেখে নির্মিত হয়নি। জাতিভেদের কঠিন বিভাজন সমাজের মধ্যে ঐক্য ও জাতীয় চেতনার বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। সেইসঙ্গে, নানাবিধ ধর্মীয় আচারবিধি, শুচিতার কঠোর নিয়ম এবং অতিরিক্ত অনুশাসনের ফলে এই সমাজ একপ্রকার কর্মনির্বাহী ও উদ্যোগহীন হয়ে পড়েছে। এই বাস্তবতার নিরিখে রামমোহন বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় সমাজে এমন এক ধর্মীয় সংস্কার প্রয়োজন যা মানুষকে রাজনৈতিক সচেতনতা, কার্যক্ষমতা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জনের পথে পরিচালিত করতে পারে। ধর্মকে কেবল আত্মার মুক্তির পথ হিসেবে না দেখে, জীবনের বস্তুগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবেই তিনি পুনঃসংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছিলেন।

আসলে, রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তার মৌলিকতা এইখানেই যে তিনি ধর্মীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে এক আধুনিক মনন ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেন। তিনি কেবলমাত্র ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস বা উপাসনা পদ্ধতিতে সংশোধন ঘটাতে চাননি, বরং ধর্মের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের প্রতিও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ধর্মের সংস্কার রাজনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক বঞ্চনার নিরসনের একটি কার্যকর উপায় হতে পারে। এই কারণেই তিনি মনে করতেন, ধর্মসংস্কারক ও তাদের বিরোধীদের মধ্যে যে সংঘর্ষ তা কেবল মতাদর্শগত বিরোধ নয়, বরং ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক নিরন্তর সংগ্রাম। রামমোহন বিশ্বাস করতেন, এই দ্বন্দ্বে ধর্ম ও উদারনৈতিক চিন্তাধারা অবশেষে স্বৈরাচার ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে সক্ষম। পাশ্চাত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের মতোই রামমোহনের লক্ষ্য ছিল ইতিহাসের ধারায় মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য সন্ধান করা। তিনি হিন্দু সমাজের অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ভারতীয় জনমানসের মনস্তাত্ত্বিক গঠন ও ধর্মীয় মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অনেক গবেষক তাঁকে বেন্থামের উপযোগবাদী মতবাদের ঘনিষ্ঠ মনে করেন। রামমোহন ইউরোপীয় ইতিহাসের নবজাগরণ থেকে ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত সময়কালকে দেখেছিলেন একটি যুগান্তকারী সামাজিক রূপান্তরের ধারা হিসেবে, যেখানে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণিচক্রের অবসান ও বুর্জোয়া শক্তির উত্থান ঘটে। এই বুর্জোয়া শ্রেণি সমাজের প্রচলিত অভিজাত ও দরিদ্র শ্রেণির মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক নতুন সামাজিক শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও নাগরিক অধিকারের ধারণা প্রতিষ্ঠা করে। রামমোহন রায় মনে করতেন, এধরনের মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ভারতেও সম্ভাবনাময় পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত করবে। এই নবীন শ্রেণির উত্থানের ফলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন ঘটছে, আর এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কারের অনুশাসনগুলিও নতুন বাস্তবতায় অভিযোজিত হওয়া আবশ্যক। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই নবীন শ্রেণিই সামাজিক মুক্তির আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমতার বাণী প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। অর্থাৎ, রামমোহনের মতে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; বরং তারা একই ঐক্যসূত্রে গাঁথা।

তবে রামমোহন এটাও বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ইউরোপীয় সমাজ বিকাশের নিয়ম ও অভিজ্ঞতাকে ভারতের বিশেষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় সরাসরি প্রয়োগ করা অনুচিত। ভারতের ইতিহাস, পরিবেশ ও চেতনার যে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, তা উপলব্ধি করে তবেই দেশীয় সমাজসংস্কার সম্ভব। তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয়

জীবনচর্চা ও চিন্তাধারার গভীর পাঠের মাধ্যমে অতীতের গৌরব, শক্তি ও সীমাবদ্ধতাগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুত্তাহহিদীন' এবং 'বেদান্ত গ্রন্থ'-এর পাঠে আমরা দেখতে পাই, তিনি একাধারে শাস্ত্রজ্ঞ, যুক্তিবাদী ও মৌলিক ভাবুক। তাঁর ব্যাখ্যা পদ্ধতি ছিল পরিশীলিত, যুক্তিনিষ্ঠ এবং প্রচলিত অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। তাঁর রচনায় বৈপ্লবিক মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাঁর পূর্ববর্তী চিন্তাধারাগুলিকে তিনি অধিক সুসংহত, আধুনিক ও বাস্তবনিষ্ঠ রূপ দিয়েছিলেন। অন্যান্য ধর্মসংস্কারকদের মতো তিনি কেবল অতীতের মূল্যবোধকে পুনরাবিষ্কার করে আধুনিক যুগে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাননি। তিনি কল্পিত স্বর্ণযুগের পুনরুজ্জীবনকে নয়, বরং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসনের অন্তর্নিহিত সারসত্তা আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেছিলেন। অতীতের নিখাদ ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষাকে তিনি বর্তমান সমাজের প্রগতিশীল ধারণার সঙ্গে সমন্বয় করে নতুন জীবনদর্শনের পথ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুত্তাহহিদীন' গ্রন্থে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, বিভিন্ন আস্তিক ধর্মের দুটি সাধারণ মৌলিক বিশ্বাস রয়েছে— (১) ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং (২) আত্মার অস্তিত্বে আস্থা। ধর্মীয় চিন্তার এই মৌলিক কাঠামো তিনি আজীবন মেনে চলেছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক বিবরণে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ছিল বাস্তবিক অর্থে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধেই, যারা নিজেদের স্বার্থে প্রাচীন ধর্মচিন্তাকে বিকৃত করে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটিয়েছিল। তাঁর মতে, এসব ব্রাহ্মণ বাহ্যিকভাবে প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও তার অন্তর্নিহিত বোধ ও বক্তব্য আত্মস্থ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই রামমোহনের লক্ষ্য ছিল বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও তন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত ব্রহ্মবিদ্যার মূল তত্ত্বকে চিহ্নিত করে, সেটিকে আধুনিক সমাজে প্রাসঙ্গিক করে তোলা। তিনি ইসলাম ধর্মের সংস্কারবাদী মুত্তাহহিদীন তথা ওয়াহাবি ধারার চিন্তা থেকে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং ইসলামকে সংস্কার ও আনুষ্ঠানিক জটিলতা থেকে মুক্ত করে তার সারতত্ত্ব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন— যদিও তাদের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকে তিনি গ্রহণ করেননি। একইভাবে, খ্রিষ্টধর্মের সংস্কার আন্দোলনও তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি খ্রিষ্টের উদার, সর্বজনীন শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে যুক্ত গোঁড়ামি ও রূপগত সংস্কারের বিরুদ্ধেই তাঁর অবস্থান ছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল— সব ধর্মের মধ্যে একটি যৌক্তিক, মানবিক ও সার্বজনীন ধর্মতত্ত্বের সন্ধান করা এবং তা সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

রামমোহনের ধর্ম সংস্কার:দর্শন ও প্রয়োগ: ভারতবর্ষের মতো একটি বহুধা ধর্মীয় ও ঐতিহ্য-আক্রান্ত সমাজে সামাজিক সংস্কার সাধনের জন্য রাজা রামমোহন রায় ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কারের পথই গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতীয় হিন্দু সভ্যতায় ধর্মতত্ত্ব এবং সামাজিক গঠন একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। ফলে সমাজকে পরিবর্তনের প্রয়াসে তিনি ধর্মগ্রন্থ ও ঐতিহ্যের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল সম্পূর্ণরূপে যুক্তিনির্ভর ও ধর্মশাস্ত্রভিত্তিক। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে এই নিষ্ঠুর প্রথার পক্ষে প্রকৃতপক্ষে কোন বৈদিক বা শাস্ত্রীয় সমর্থন নেই। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ঋগ্বেদ, উপনিষদ, গীতা, মনুসংহিতা, প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণসমূহের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও উদ্ধৃতি পর্যালোচনা করে প্রমাণ করেন যে সতীদাহ প্রথা প্রকৃত হিন্দু ধর্মবোধের পরিপন্থী।

রামমোহন প্রাচীন স্মৃতিকারদের মধ্যে যাঁদের তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, নারদ, বিষ্ণু ও ব্যাস। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এই প্রাচীন রচয়িতারা তাঁদের রচনায় নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অথচ পরবর্তীকালের বহু আধুনিক টীকাকার সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ করে নারীদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেন। এই আর্থিক বঞ্চনা বিধবা নারীদের এমন নিদারুণ অসহায়তার মধ্যে ফেলত, যার পরিণতিতে অনেকেই জীবন বিসর্জনের পথ বেছে নিতেন— এভাবেই সতীদাহ

Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15812707

প্রথার সূচনা ঘটে। একইরকমভাবে, হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ প্রথার উদ্ভবও ছিল শাস্ত্রের মূলনীতির বিকৃত প্রয়োগ। রামমোহনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ধর্মশাস্ত্র বহুবিবাহের অধিকারকে একটি ব্যতিক্রম হিসেবে মেনে নিয়েছে, কিন্তু তা কখনোই সাধারণ বা স্বাভাবিক বিধান নয়। তিনি প্রস্তাব করেন, কোনও পুরুষ যদি জীবিত স্ত্রীর উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে চান, তবে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে রাজদ্বারে আবেদন করতে হবে, এবং একটি নিরপেক্ষ ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি তার আবেদনের শাস্ত্রানুগতা যাচাই করবে। শুধুমাত্র সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই দ্বিতীয় বিবাহের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বোঝা যায়, রামমোহনের চিন্তাধারায় অতীত ঐতিহ্য এবং সংস্কারের মধ্যকার ভারসাম্য রচনার এক সচেতন প্রয়াস ছিল। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় রীতিনীতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই তাঁকে এই ধরনের যুক্তিনিষ্ঠ সংস্কার-চিন্তা গঠনের সুযোগ দেয়। তবে একাধিক ক্ষেত্রে তাঁকে প্রচলিত ব্যাখ্যার সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে তীব্র প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে তিনি নিপুণভাবে যুক্তি ও তথ্যের মাধ্যমে তাঁর অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিমা পূজার প্রচলনকে "অনাদিপরম্পরা প্রসিদ্ধি" দ্বারা সমর্থন করার যে যুক্তি দিয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তা খণ্ডন করে রামমোহন বলেন—ভারতে ঈশ্বরভক্তির প্রথা শাস্ত্রসম্মত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে শুধুই লোকাচার বা বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। এবং এই অবস্থার সৃষ্টির পেছনে গত একশ বছরের অধঃপতিত ধর্মচর্চার ভূমিকাই মুখ্য। এছাড়াও, সহমরণ প্রথা, শংকরাচার্যের কাল নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়েও তিনি প্রাচীন ঐতিহ্য এবং নবীন বাস্তবতার পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তাঁর মতামত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পদ্ধতিগত দৃঢ়তা ও মননশীল ব্যাখ্যা এইসব সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডকে শুধু প্রগতিশীল আন্দোলনে রূপ দেয়নি, বরং ঐতিহ্য ও যুক্তির সমন্বয়ে এক নতুন ধর্মতাত্ত্বিক সমাজ-ভাবনার সূচনা করেছিল।

রামমোহনের গণশিক্ষা উদ্যোগ: রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কার ভাবনায় 'গণশিক্ষা' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সামাজিক রূপান্তর ঘটাতে শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন যথেষ্ট নয়; বরং দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই পরিবর্তন আনতে হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে মানসিক প্রস্তুতি ও বোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই প্রস্তুতি গড়ে তুলতে পারে একমাত্র ব্যাপক লোকশিক্ষা, যা সমাজের গভীরে প্রোথিত সংস্কার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহায়ক হতে পারে। রামমোহনের মতে, জাতীয় সংস্কার যদি জনমনে গেঁথে যায়, তবে তা আইনের মাধ্যমে হঠাৎ করে দমন করতে গেলে ব্যাকফায়ার করতে পারে। মানুষ সেই পরিবর্তন গ্রহণ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকলে, আইন অকার্যকর হয়ে পড়ে বা তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাই তিনি আইনের পরিবর্তে আগে শিক্ষার মাধ্যমে জনমত গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা হতে পারে সমাজবোধ জাগরণের একমাত্র পথ। এই চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে রাজা রামমোহন সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যেও শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হন। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুসারী রামচন্দ্র মৌলিককে বলেছিলেন, নিচু শ্রেণির মানুষদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে নিজেকে নিয়োজিত করা যেন তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে ওঠে। জাতপাতের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে রামমোহন পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। তবু এই বর্ণভেদের বিরুদ্ধে তিনি কোনও সরাসরি আইনগত পদক্ষেপের পথে হাঁটেননি, কারণ তিনি বুঝেছিলেন—এই সামাজিক বিভাজন মানুষের চেতনায় এতটা গভীরভাবে প্রোথিত যে তা কোনও দমনমূলক ব্যবস্থার দ্বারা উপড়ে ফেলা কঠিন। বরং, ক্রমশ শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা বাড়িয়ে এই কুসংস্কার থেকে মুক্তি সম্ভব— এই বিশ্বাসেই তিনি স্থির ছিলেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি একই কৌশল গ্রহণ করেন। এই নির্মম রীতির বিলোপের জন্য তিনি তিনটি পন্থা অবলম্বন করেন। প্রথমত, তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পুস্তক রচনা করে সতীদাহ প্রথার অশাস্ত্রীয়তা তুলে ধরেন। তাঁর রচিত A Second Defense of the Monotheistical System

of the Vedas (১৮১৭)-এ তিনি নির্দ্বিধায় বলেন, এই প্রথা প্রকৃত হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। দ্বিতীয়ত, তিনি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জনমত গঠনে সচেষ্ট হন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা সংবাদ কৌমুদী ও বাঙ্গাল গেজেট- এর মাধ্যমে তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার চালান, যাতে সমাজে এ নিয়ে যুক্তিবাদী বিতর্ক এবং বিবেকজাগরণ সম্ভব হয়। তৃতীয়ত, তিনি সতীদাহে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক নারীদের শ্মশান থেকে উদ্ধার করতেন, তাঁদের জীবনরক্ষা করতেন। এই প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি শুধুমাত্র মত প্রকাশেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং প্রথাটির বিরুদ্ধে সরাসরি সামাজিক হস্তক্ষেপও করেছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে লর্ড বেন্টিঙ্ক যখন ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ বিলুপ্তির জন্য আইন প্রণয়ন করেন, তখন রামমোহন তাঁর পূর্ববর্তী সংশয় ও দ্বিধা কাটিয়ে আইনের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন। যদিও আইন প্রণয়নকে তিনি সামাজিক সচেতনতার ফল বলেই দেখেছিলেন, তবুও সেই আইন রূপায়ণের প্রক্রিয়ায় রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিক্রিয়া দমন করতে তিনি বেন্টিঙ্ককে সর্বাত্মক সহায়তা করেছিলেন। তিনি জানতেন, সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে কেবল প্রশাসনিক ব্যবস্থা নয়, সাধারণ মানুষের মনের পরিবর্তনই সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। সেই কারণেই তিনি লোকশিক্ষাকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কারের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

জনমত ও ঐতিহ্যবোধে রামমোহনের অবস্থান: রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তাধারায় জনসাধারণের সম্মিলিত মত বা সমষ্টিগত ইচ্ছা এক বিশেষ তাৎপর্য ধারণ করেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজের মৌলিক রীতিনীতি নির্ধারণে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক অভ্যস্ততা এক প্রকার নৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলে, যা উপেক্ষা করা চলে না। হিন্দু পারিবারিক ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আইনচর্চায় এই বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন জীমূতবাহনের ‘দায়ভাগ’ শাস্ত্রের ওপর, যেটি বহুকাল ধরে বাংলার হিন্দু সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি পরিচালনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে আসছিল। এই গ্রন্থ অনুযায়ী, হিন্দু বাঙালি ব্যক্তি তাঁর পিতৃপ্রাপ্ত অথবা নিজস্ব উপার্জিত সম্পত্তির ওপর পূর্ণ অধিকার ভোগ করেন, তিনি ইচ্ছেমতো তা হস্তান্তর, দান বা বিক্রি করতে পারেন। কিন্তু রাজা রামমোহনের সময়কালে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বিজ্ঞানেশ্বরের ‘মিতাক্ষরা’ মতানুসারে সম্পত্তির অধিকারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয় আদালতের বিভিন্ন রায়ের মাধ্যমে। এতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার সংকুচিত হয়ে পড়ে। রামমোহন এই অবস্থার বিরোধিতা করেন। তিনি যুক্তিপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখান, বাংলার হিন্দু সমাজে যেহেতু দায়ভাগ বহুযুগ ধরে কার্যকর ছিল এবং মানুষ এই ব্যবস্থার সঙ্গে মানসিকভাবে একাত্ম হয়ে পড়েছিল, তাই এ প্রথাকে আদালতের রায়ে খারিজ করা অবিচারস্বরূপ। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, যদি মিতাক্ষরার বিধান বাংলায় জোরপূর্বক আরোপ করা হয়, তবে তার অর্থনৈতিক পরিণতি হবে মারাত্মক। জমির মালিকেরা তাদের পৈতৃক সম্পত্তি নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে না পারলে তা বিভাজনের ফলে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগ কমবে, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ রুদ্ধ হবে এবং জমিকে অর্থনৈতিক সম্পদে রূপান্তরের যে প্রক্রিয়া তখনকার সমাজে শুরু হয়েছিল, তা ব্যাহত হবে। রামমোহনের কাছে আইনের কার্যকারিতা কেবল বিচারপ্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ ছিল না— তিনি বিশ্বাস করতেন, আইন প্রণয়নের সময় একটি জাতির সামাজিক অভ্যাস, ঐতিহ্য ও বাস্তব জীবনচর্চাকে সম্মান করা উচিত। আইন যদি জাতির অভ্যন্তরীণ চেতনার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে তা সমাজে বিভ্রান্তি ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব পরবর্তীকালে বিচারপতি গ্রে-র রায়ে প্রতিফলিত হয়। বিচারপতি মন্তব্য করেন—"There are many important differences between the doctrines of the Benaras and the Bengal schools, the latter generally favouring alienation of property and thereby facilitating mercantile speculations." এই মন্তব্য রাজা রামমোহনের অবস্থানেরই একটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি হিসেবে পরিগণিত হয়।

Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15812707

রায় ঘোষণার পূর্বে বিচারপতিকে বোঝাতে গিয়ে রামমোহন যেসব যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন, বিচারপতির বক্তব্যে তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। সার্বিকভাবে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে, তিনি জনমানস, ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইন ও নীতিনির্ধারণের প্রবর্তক ছিলেন। সামাজিক সংস্কার ও আইনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় তাঁর এই সুদূরদর্শিতা আজও প্রাসঙ্গিক।

নৈতিকতার ভিত্তিতে রামমোহনের সমাজভাবনা: সতীদাহ প্রথা বিলোপের প্রশ্নে রাজা রামমোহন রায় স্পষ্টভাবে দেখিয়েছিলেন যে, ঐতিহ্যগত অনুশাসনের তুলনায় নৈতিক মূল্যবোধ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তিনি ভারতীয় শাস্ত্র ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তবুও সমাজজীবনের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য যখন নৈতিকতার গুরুত্ব অধিক জরুরি হয়ে ওঠে, তখন তিনি নির্দ্বিধায় শাস্ত্রীয় ধারা অতিক্রম করেন। তাঁর চিন্তায় নৈতিকতা হয়ে ওঠে সমাজ সংস্কারের অন্যতম চালিকাশক্তি। রামমোহন ছিলেন অদ্বৈত দর্শনের অনুগামী, কিন্তু এই দর্শনে আস্থাশীল হয়েও তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীকে অস্বীকার করেননি। বরং তিনি গোটা সমাজজীবনকেই এক আধ্যাত্মিক বোধের অন্তর্গত বলেই বিবেচনা করতেন। ফলে, তাঁর ধর্মভাবনা নিছক মোক্ষলাভ বা তাত্ত্বিক ঈশ্বর-অন্বেষণ ছিল না, বরং তা সমাজকল্যাণ ও মানবিক উন্নয়নের ধারায় গভীরভাবে প্রবাহিত। এই সমাজকল্যাণকামী ধর্মভাবনার কেন্দ্রে ছিল নৈতিকতার প্রশ্ন। তিনি মনে করতেন, নৈতিকতা ছাড়া কোনও সমাজ টেকসই ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে না। সেই কারণে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় নীতিমালার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছিলেন। যদিও হিন্দু ও খ্রিষ্টধর্ম উভয়ের নীতিবোধের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল, তথাপি খ্রিষ্টধর্ম, বিশেষ করে যিশু খ্রিষ্টের নৈতিক উপদেশগুলি, তাঁর উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। রামমোহনের মতে, খ্রিষ্টীয় নীতিমালা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনকে শুদ্ধ রাখার সর্বোত্তম পথ নির্দেশ করে। যিশুর নৈতিক শিক্ষা শুধু বিশ্বাস বা আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং তা বাস্তব সমাজজীবনের আচরণবিধি হিসেবেও কার্যকর। তিনি বিশেষভাবে যিশুর সেই উপদেশকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন যেখানে বলা হয়— 'তুমি তোমার ঈশ্বরকে ভালোবাসবে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত চেতনা দিয়ে— এটাই প্রথম ও প্রধান নির্দেশ। এবং দ্বিতীয় নির্দেশটিও তার সমান— তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে নিজের মতো করে।' এই উপদেশগুলি রামমোহনের নীতিদর্শনের ভিত্তি গঠন করেছিল। তাঁর মতে, ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেম একে অপরের পরিপূরক। মানবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপলব্ধি সম্ভব— এই বিশ্বাস ছিল তাঁর ধর্মবোধের সারকথা।

অন্যদিকে, হিন্দু ধর্মের নৈতিক দিক সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল নিরপেক্ষ ও গভীর। তিনি মনে করতেন, হিন্দু ধর্মে নীতিবোধের গুরুত্ব থাকলেও, তা প্রথাগত আধ্যাত্মিকতার তুলনায় গৌণ হয়ে পড়ে এবং সামাজিক আচরণের উপর তার যথেষ্ট প্রভাব পড়ে না। এই সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি খ্রিষ্টীয় নীতিবোধকে সমাজ নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকর উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহনের কাছে ধর্ম ছিল শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক অনুশীলন নয়, বরং একটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, যার কেন্দ্রে রয়েছে মানবকল্যাণ ও নৈতিক শুদ্ধতা। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি নৈতিক মূল্যবোধকে ধর্মচিন্তার প্রধান উপাদানে পরিণত করেন এবং তার ভিত্তিতেই সমাজ সংস্কারের রূপরেখা নির্মাণ করেছিলেন।

রামমোহন রায়ের ভাবনা ও বাস্তবতা: শ্রেণি স্বার্থ ও সংস্কারের টানাপড়েন: রাজা রামমোহন রায়ের নৈতিক দর্শন ও আদর্শিক ভাবনার বিশ্লেষণে যখন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়, তখন কিছু স্ববিরোধ ও প্রশ্নচিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিশোরীচাঁদ মিত্র যেমন প্রশ্ন তুলেছিলেন— রামমোহন রায় দেওয়ানের পদে কর্মরত থাকাকালীন বিপুল অর্থ উপার্জন করে এতটাই বিত্তবান হয়েছিলেন যে তিনি বছরে দশ হাজার টাকা আয়-সম্পন্ন

জমিদার হয়ে ওঠেন। এই তথ্য সত্য হলে তাঁর নৈতিক অবস্থানের দৃঢ়তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। একইভাবে, কে. এস. ম্যাকডোনাল্ড মন্তব্য করেছিলেন যে রায় মাত্র দশ বছরের চাকরিজীবনে এমন সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন, যার দ্বারা তিনি বার্ষিক ১০০০ পাউন্ড আয়ের মালিক হন। এই প্রেক্ষিতে ড. অরবিন্দ পোদ্দার যুক্তি দেন যে, কলকাতার নবাগত 'বুদ্ধিমার্গীয়' পরিবেশে রামমোহনের সক্রিয় সম্পৃক্ততা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন মূলত বিত্ত সংগ্রহে তৎপর একজন ব্যক্তি, যিনি অর্থ উপার্জনের প্রক্রিয়ায় নৈতিকতার প্রশ্নকে ততটা গুরুত্ব দেননি। প্রকৃত অর্থে, রামমোহনের জীবনধারা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবিকা নির্বাহের ধরন ছিল সেই সময়ের অভিজাত শ্রেণির অন্যান্য 'রাজা' বা বিত্তবান বাবুদের মতোই। তাঁর চিন্তায় বেন্থাম, জেমস মিল, ডেভিড রিকার্ডো ও জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রভাব দৃশ্যমান হলেও, জীবনের বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্রে তিনি অনেক সময়ই শ্রেণিস্বার্থের কারণে স্ববিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতায় যাঁরা এই নবীন জমিদার মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁরা ব্রিটিশ শাসকদের আনুকূল্যে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করলেও সামাজিক মর্যাদা অর্জনে ব্যর্থ হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাদের জমির মালিকানা দিলেও সমাজে নেতৃত্বের ভূমিকা নিশ্চিত করতে পারেনি। মহিত মৈত্র যথার্থভাবেই বলেন, এই নবোদ্ভুত অভিজাত শ্রেণি রামমোহনের নেতৃত্বে ভূসম্পত্তি ও জমিদারি কিনে কোম্পানির শাসনব্যবস্থায় নিজেদের অর্থ বিনিয়োগ করে এক প্রকার 'নব জমিদার' হয়ে উঠলেও তাঁরা অধিকাংশই সমাজনেতা হিসেবে স্বীকৃতি পাননি। এই প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশদের নিকট থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করেন রামমোহনসহ এই শ্রেণির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। হিন্দু সমাজে সংস্কারের নামে তাঁরা একধরনের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার কৌশল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। লক্ষ লক্ষ কৃষকের আর্থিক শোষণের মাধ্যমে সঞ্চিত পুঁজি নিয়েই তাঁরা শহরে 'সাংস্কৃতিক নবজাগরণ' সূচনা করেন। কিন্তু এই নবজাগরণ ইউরোপীয় রেনেসাঁর মতো সমাজের মূল কাঠামো পরিবর্তনের কোনো উদ্যোগ নেয়নি, বরং মধ্যযুগীয় শোষণব্যবস্থাকেই নানা রূপে টিকিয়ে রাখে। রেনেসাঁ বিষয়ে জার্মান সমাজতাত্ত্বিক আলফ্রেড ভন মার্টিন যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছিলেন—যেমন মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভাজন—তা বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে প্রায় অনুপস্থিত। বাংলার শহুরে সংস্কার আন্দোলনগুলি ইউরোপের মতো সামন্ততন্ত্র ভাঙার চেষ্টার পরিবর্তে নিজস্ব শ্রেণিস্বার্থ রক্ষায়ই অধিক মনোনিবেশ করে। গ্রামের শোষিত শ্রেণির স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন, যা সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছিল, তার সঙ্গে এই শহুরে সংস্কারের কোনও সংযোগ গড়ে ওঠেনি।

শহর ও গ্রামের এই দ্বৈত আন্দোলনের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে ১৮৩৮ সালে 'ভূমধ্যাধিকারী সভা' (Landholders' Society) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে, যার সদস্য ছিলেন রামমোহনের 'আত্মীয়সভা' ও রাধাকান্ত দেবের 'ধর্মসভার' নেতৃবৃন্দ। যদিও সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে এই দুই গোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে মতভেদ পোষণ করতেন, তবুও কৃষক শ্রেণির প্রতিরোধ আন্দোলন দমনে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট হয় যে, রামমোহনের সমাজ সংস্কার আন্দোলন বুর্জোয়া শ্রেণির উত্থান ঘটিয়ে ধনতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের বদলে, এক ধরনের জমিদার- মধ্যবিত্ত স্বার্থরক্ষার উদ্যোগে পরিণত হয়েছিল। বাংলার অর্থনীতির কাঠামো মৌলিকভাবে রূপান্তরিত হয়নি, সমাজ পরিবর্তন সীমাবদ্ধ থেকেছে শহরকেন্দ্রিক সীমিত দৃষ্টিভঙ্গির গণ্ডিতে। ফলে এই সংস্কার আন্দোলনের পেছনে থাকা ইউরোপীয় আদর্শ, যদিও ঋদ্ধ ছিল, বাস্তব প্রয়োগে তা শ্রেণিচেতনা ও ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে আপোষ করে। রামমোহনের মতো অগ্রণী চিন্তাবিদও এই আত্মবিরোধ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। ব্রিটিশ শাসকের আনুকূল্য তাঁকে অনেক সুবিধা দিলেও শোষিতদের মুক্তির সংগ্রামে তিনি সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হতে পারেননি। তাঁর ভাবনা ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, কিন্তু কর্মপন্থা ছিল শ্রেণিগত স্বার্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই দ্বৈততা রামমোহনের ভাবনা ও বাস্তব জীবনের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। রাজা

Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15812707

রামমোহনও এর ব্যাতিক্রম ছিলেন না। তাঁর জীবনযাত্রায় সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা লক্ষ্য করা যেত কিন্তু তার চিন্তাধারাতে বুর্জোয়া ভাবধারা ফুটে উঠত। তাই তাঁকে 'ফিউডাল বুর্জোয়া' বলে অনেকেই চিহ্নিত করেছেন। রামমোহন রায়ের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাঁর জীবন ও চিন্তাধারার মধ্যে স্ববিরোধিতা দেখা দিত। তিনি বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালালেও বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন। বিধবাবিবাহ লোকাচার সম্মত না হওয়ার জন্য বিধবা বিবাহ তাঁর কাছে সদাচর বলে বিবেচিত হয়নি এবং সমাজে তার প্রচলনের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। আবার, যে রামমোহন রায় সতীদাহের মতো অমানবিক প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন তিনিই কলকাতাতে সমসাময়িককালে প্রচলিত গোলাম ব্যবসার বিরোধিতা করেননি। একেশ্বরবাদী রামমোহনের ধর্ম চিন্তার মধ্যেও স্ববিরোধিতা দেখা গেছে। তিনি বেদান্তের মায়াবাদকে গ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রহ্মকে সত্য এবং জগতকে মিথ্যা বলে প্রচারও করেছিলেন। অথচ তিনিনিজেই ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা প্রচলনের দাবি জানানোর সময় বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বের গুরুত্বকে অস্বীকার করে বলেন যে অধ্যাত্মিক জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণকারী বা সমাজ কারো কোনও ব্যবহারিক কাজে আসবে না। বেদান্তের তত্ত্ব ব্যক্তিকে সমাজের উপযুক্ত সদস্য করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাধা দেয়। আবার একই ভাবে জাতিভেদ প্রথার প্রতি তিনি বিরূপ মনোভাব পোষণ করলেও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন তিনি করেননি, বরং সারা জীবন তিনি জাতিভেদ প্রথার নিয়মগুলি নিষ্ঠাভরে পালন করে গিয়েছিলেন। সেই কারণেই তিনি যখন ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য গেলেন তখন তিনি তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মণ পাচক নিয়ে গিয়েছিলেন। খাদ্য ও পানিয়ের ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু সমাজের প্রচলিত নিয়ম কানুন মেনে চলতেন। ব্রাহ্মণদের জন্যনিষিদ্ধ খাদ্যগ্রহণ তিনি করতেন না। এমন কি রামমোহন রায়ের বন্ধু মি: অ্যাডম এর মতানুসারে রামমোহন রায় অহিন্দুদের সঙ্গে বা অন্য জাতের বা অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে একসঙ্গে খেতেন না।

রামমোহন রায়ের উদারনৈতিক চিন্তা ও শ্রেণিস্বার্থের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব: রাজা রামমোহন রায়ের ভাবাদর্শিক অবস্থান ও তাঁর বাস্তব কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈততা বা দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে— উদারনৈতিক মূল্যবোধের প্রতি তাঁর আনুগত্য এবং ব্যক্তিগত ও শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার প্রক্রিয়ায় তাঁর অংশগ্রহণ। ফরাসি বিপ্লবের মতো সামন্ততন্ত্র-ধ্বংসকারী ঐতিহাসিক ঘটনাকে তিনি প্রশংসা করলেও, ভারতীয় প্রেক্ষিতে কৃষকদের ভূস্বামী বিরোধী আন্দোলনকে তিনি কখনোই সমর্থন করেননি বরং তিনি দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের বার্ষিক ভাতা বৃদ্ধির জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আবেদন জানান এবং বাদশাহের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করে তাঁকে ইংল্যান্ডে দূত রূপে প্রতিনিধিত্ব করাকে সম্মানের বিষয় বলে বিবেচনা করেন। এই সমস্ত কর্মকাণ্ড তাঁর শ্রেণিগত অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে, যা নিঃসন্দেহে বিত্তবান মধ্যবিত্ত জমিদার শ্রেণির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। এই শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার প্রবণতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নীলচাষ প্রসঙ্গে। যখন সারা দেশে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের ঢেউ উঠেছিল, তখন রামমোহন ও তাঁর সমগোত্রীয় নব্য জমিদাররা শ্বেতাঙ্গ শোষকদের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছিলেন। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার টাউন হলে আয়োজিত এক সভায় ব্রিটিশ মূলধন ও দক্ষতা যাতে বাধাহীনভাবে কৃষি ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারে, তার পক্ষে একটি দরখাস্ত গৃহীত হয়, যেখানে রামমোহনও স্বাক্ষর করেন। সেই সভায় তিনি বলেন, তিনি নীলকুঠির সংলগ্ন গ্রামগুলিতে ভ্রমণ করে দেখেছেন যে সেখানকার মানুষরা অপেক্ষাকৃত ভালো পোশাক পরেন ও ভালো অবস্থায় থাকেন। যদিও তিনি আংশিক ক্ষতির কথা স্বীকার করেন, তবুও তাঁর মতে অন্যান্য ইউরোপীয়দের তুলনায় নীলকররা অধিকতর উপকার করেছে। এই অবস্থান যে নিঃসন্দেহে শোষকদের প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থনের প্রতীক, তা বলাই বাহুল্য। রামমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো অভিজাত নব্য জমিদাররা আসলে ভারতে ইউরোপীয়দের 'শ্বেত জমিদার'

শ্রেণি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৩২ সালে লন্ডনের একটি পত্রিকায় ইউরোপীয়দের ভারতে স্থায়ী বসবাসের পক্ষে প্রবন্ধ লিখে রামমোহন ইউরোপীয়দের জমি কেনার পক্ষে নয়টি যুক্তি তুলে ধরেন। পরে ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকার যখন ইংরেজ ব্যবসায়ীদের জমি ক্রয়ের অনুমতি প্রদান করে, রামমোহন তাতে প্রকাশ্যে সন্তোষ জানান। তাঁর মতে, ইউরোপীয় সম্মানীয় বাসিন্দারা এশিয়াকে সভ্য করে তুলবে। এইভাবেই তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা, বাণিজ্য ও শিল্পবিকাশের ধারণাকে সমর্থন করে বলেন যে ইউরোপীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ যত বাড়বে, ততই সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতিতে ভারতের উন্নয়ন ঘটবে। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, রামমোহন, দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর অবাধ বাণিজ্যনীতিকে শিল্প বিপ্লবের পূর্বশর্ত হিসেবে দেখতেন এবং সেই কারণেই তাঁরা পাশ্চাত্য বাণিজ্যপন্থার প্রতি সমর্থন জানাতেন।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তা ও কার্যক্রমের বিচার করতে গেলে তাঁর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে যুগান্তকারী সমাজচিন্তকের বৈশিষ্ট্য যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি তাঁর শ্রেণিগত অবস্থান ও সীমাবদ্ধতাও চোখ এড়ায় না। তিনি নিঃসন্দেহে ভারতের নবজাগরণের পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং সমাজের গোঁড়ামি, কুসংস্কার, ধর্মীয় উগ্রতা ও নারী-অবমাননার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুক্তিবাদ, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং একেশ্বরবাদের আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন। বিশেষ করে সতীদাহ ও বহুবিবাহের মতো প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। পাশাপাশি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তিনি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। তবে, জাতপাত ও সামাজিক বৈষম্য নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি সীমিততা রয়ে গিয়েছিল। তিনি জাতিভেদে চিন্তিত হলেও, জাতিভেদের বিরুদ্ধে কোনো মৌলিক রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। সম্ভবত তাঁর সময়কালের প্রেক্ষিতে জাতপাতের কিছু ইতিবাচক সামাজিক ভূমিকার প্রতি একটি ঐতিহ্যগত শ্রদ্ধা কাজ করত, যার অংশ তিনি নিজেও ছিলেন। তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পড়াশোনার পেছনে ছিল মূলত তৎকালীন উদীয়মান পুঁজিবাদী সমাজের চিন্তাবিদদের—যেমন বেন্থাম, মিল, রিকার্ডো প্রমুখের প্রভাব। এই কারণেই রামমোহনের চিন্তা অনেকাংশেই ঊর্ধ্বশ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং তাঁর সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা একটি মৌলিক শ্রেণিগত পুনর্গঠনের পথ না নিয়ে সীমিত, ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে। সুতরাং, রামমোহন রায়ের ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত ভাবনা আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ তা এখনও জাতপাত, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদ ও মানবিকতার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে তাঁর সমাজ-ভাবনার সীমাবদ্ধতা এবং শ্রেণিস্বার্থঘেঁষা অবস্থান আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সত্যিকার সামাজিক রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন গভীর শ্রেণি-সচেতনতা ও জনমুখী রাজনৈতিক কর্মকৌশল।

সূত্রনির্দেশ

১. চক্রবর্তী, অজিতকুমার, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ,* এলাহাবাদ, ইন্ডিয়ান প্রেস, ১৯১৬।
২. Smith, George, *The Life of Alexander Duff,* Vol-1, London, Hodder & Stoughton, 1879.
৩. বিশ্বাস, দিলীপকুমার, *রামমোহন সমীক্ষা,* কলিকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, 1994।
৪. সরকার, সুব্রত, *রামমোহন ও বাংলার নবজাগরণ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬।
৫. অমলেন্দু, দে, *ঊনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কার ও রামমোহন রায়,* দে'জ, ১৯৯৮।

Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15812707

৬. Nag, K.D. & Burman, D., *The English works of Raja Rammohun Roy*: *Essays on the Rights of Hindoos over ancestral Property according to the Law of Bengal, Calcutta*, Sadharan Brahmo Samaj, 1856.
৮. Biswas, Dilip Kumar, & Ganguly, Prabhat Chandra., *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy*: Compiled and edited by the late S.D. Collet, and completed by a friend, Calcutta, Sadharan Brahmo Samaj, 1962, Print.
৯. বিশ্বাস, দিলীপকুমার, *রামমোহন সমীক্ষা*, কলিকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, 1994 মুদ্রণ।
১০. Biographical Memoir of Late Raja Rammohun Roy: Calcutta Review, Volume-IV, No VIII, July-December 1845, Print.
১১. ভট্টাচার্য, কুমুদ কুমার, *রাজা রামমোহন: বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা, বর্ণপরিচয়, 1986, নবমুদ্রণ।
১২. Moitra, Mohit, *A history of Indian Journalism*, Calcutta, National Book Agency Private LTB,1955, Print.
১৩. Martin, Alfred Von, *Sociology of the Renaissance*, London, Trence Trubner & co LTD. 1945, Print.
১৪. Nag, K.D. & Burman, D, *The English works of Raja Rammohun Roy: Essays on the Rights of Hindoos over ancestral Property according to the Law of Bengal*, Calcutta, Sadharan Brahmo Samaj,1856, Print.
১৫. Nag, K.D. & Burman, D, *The English works of Raja Rammohun Roy: Essays on the Rights of Hindoos over ancestral Property according to the Law of Bengal*, Calcutta, Sadharan Brahmo Samaj,1856, Print.
১৬. Young India, Vol. 9, 1927 (Collected Writings on Rammohun Roy by Gandhi and others.